প্রবচন

"যে চাষা সময়ে না বাহে হাল তার দুঃখ যাবৎ কাল।" আমার মা আজ বেঁচে থাকলে নির্ঘাৎ এই প্রবাদটাই স্মরণ করিয়ে দিতেন আমাদের। আমাকে ও আমার স্বামী ক্ষীরোদকে। এমন মোক্ষম লাগসই প্রবাদবাক্য আর হয় না। এটি যেন আমাদের দুজনের জন্যে স্পেশাল অর্ডার মাফিক বানিয়েছিলেন এই প্রবাদবাক্যের রচয়িতা কিংবা রচয়িত্রী, তিনি যেই হোন না কেন।

সত্যিই তো। আজ বিশ বছর ধরে বাস করছি নিজেদের এই ফ্ল্যাট বাড়িতে। লোকে বাড়ি কিনেই - তা সে বাংলো বাড়ি, বাগানবাড়ি কি ফ্ল্যাটবাড়ি যাই হোক না কেন - নিজের নামে তড়িঘড়ি রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে রাখে। আর আমাদের বিশ বছর পর এখন টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কড়া নোটিসখানা পাবার পর:- যারা আজও নিজেদের ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রি করেনি তাদের আর মাত্র তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হল। এর মধ্যে রেজিস্ট্রি না সম্পন্ন করলে প্রতিদিন একশ টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে। তারপর যেমন যেমন সময় যাবে ক্ষেপে ক্ষেপে জরিমানার অঙ্ক বাড়তে থাকবে এবং শেষমেশ ফ্যাটের মালিকানাই বাতিল করে দেওয়া হবে।

নোটিস পেয়ে আমরা তো আকাশ থেকে পড়লাম। কেন বলছি। ফ্ল্যাটখানা হস্তগত হবার পর স্বভাবতই সেটিকে রেজিস্ট্রি করিয়ে নেবার কথা মনে হয়েছিল আমাদের। আমাদের পূর্বপরিচিত যে কজন আমাদের আগে থেকে এ তল্লাটে বসবাস করছেন তাঁদের প্রশ্ন করায় তাঁরা খুব সঙ্কুচিতভাবে বললেন বাড়ি পেয়েই তাঁরা যথারীতি রেজিস্ট্রি করিয়েছেন কিন্তু পরে অন্যদের কাছে শুনলেন কাজটা মোটেই উচিত হয়নি। আমাদের এই বাড়িগুলোর ব্যাপারে নাকি অনেকগুলো পার্টি আছে। প্রথম পার্টি দ্বিতীয়কে কতকগুলি সর্তে লিজ দিয়েছে। দ্বিতীয় তৃতীয়কে, তৃতীয় চতুর্থকে। মোটমাট সবসুদ্ধু ঠিক কতগুলো পার্টি আছে এবং প্রত্যেক ফ্ল্যাটের মালিকের পক্ষে কোন কোন পার্টির কি কি সর্ত বাধ্যতামূলক ভাবে পালনীয় এবং আইনের এই তুর্কিনাচের ঘোরপ্যাঁচে উক্ত মালিকের সঠিক অবস্থান কি এবং কোথায় ---- এ ব্যাপারে আইন কি বলে ---- এসব কিছুই বোধগম্য হয়নি আমাদের পূর্বজদের। তাঁরা বাড়ি রেজিস্ট্রি করে ফেলেছেন এবং পরে সেটা যে একটা গর্হিত পদক্ষেপ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে অপরাধের গ্লানিতে মূহ্যমান হয়ে আছেন।

দেখলাম অধিকাংশ বাসিন্দাই তাদের বাড়ি রেজিস্ট্রি করেনি এবং পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দলেভারী লোকেরাই ঢের বেশী সোচ্চার এবং দৃশ্যত ঢের বেশী ওয়াকিবহাল। তাদের সামনে কেউ উক্ত প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলে তাকে ঘিরে ধরে দেড়েমুষে এমন জ্ঞানদানে লেগে যাবে যে শ্রোতা আর পালাবার পথ পাবে না। এদের সঙ্গে দু-এক বার মোকাবেলা হবার পর এ কারণেই এ ব্যাপারটা নিয়ে আমরা প্রকাশ্যে উচ্চবাচ্য করতাম না আর। তারপর ভুলেই গিয়েছিলাম এত বছর ধরে।

হঠাৎ ওই রূঢ় নোটিসটা এসে দারুণভাবে চমকে দিল আমাদের। ক্ষীরোদ দু-একজন রেজিস্ট্রি বিরোধি নেতার সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা আঁচ করার চেষ্টা করবে কিনা ভাবছিল। বেশী ভাবতে হল না। তারাই এসে হাজির হল ছাপানো ইস্তিহার নিয়ে। নোটিসের বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করবে ওরা। দৈনিক পঞ্চাশ হাজার টাকা ফী দিয়ে নামী উকিল রাখবে। প্রত্যেক বাড়ি থেকে চাঁদা তুলছে মামলার খরচ বাবদ। আপাতত বাড়ি পিছু দুহাজার টাকা। শুনলাম সব বাড়ি থেকেই চাঁদা দিচ্ছে। এমনকি যারা নিজেদের বাড়িগুলো অনেক আগে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়েছে তাদের কাছ থেকেও পাওয়া যাচ্ছে চাঁদা। সংখ্যালঘুদের পায়ের তলার মাটি সর্বত্রই কমজোর। হয়তো নিরাপত্তার কারণেই চাঁদা দিচ্ছে তারা। হাই কোর্টে রেজিস্ট্রি বিরোধিরা মামলা জিতলে বাড়ি রেজিস্ট্রি করার খরচ ফেরত পাওয়া যাবে, সেই সুদূরপরাহত আশাতেও হয়তো চাঁদা দিচ্ছে কেউ কেউ।

বিশ বছরের ফেলে রাখা কাজ তিন হপ্তার মধ্যে যেমন করে হোক করতেই হবে ভেবে ক্ষীরোদ বেশ

মুষড়ে পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে সাহস সঞ্চয় করলো যখন দেখলো বিরোধীদলের কেউ কেউ এজেন্টদের দোরে ঘোরাফেরা করছে ঝটপট নিজেদের ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রি করে ফেলার জন্যে। মনে আরও জোর পেলো যখন জানলো আমাদের উল্টোদিকের ডুপ্লেক্সের বাসিন্দা করমবীর দাসজীও একই পথের পথিক। তারও একাজটি এযাবৎ পড়ে আছে এবং এখন উঠেপড়ে লেগেছেন ঝটপট কাজটি মিটিয়ে ফেলতে। দাসজী বছর আষ্টেক আগে এ পাড়ায় এসেছেন। দীর্ঘদিন ধরে নিকটতম প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও দুটি পরিবারে প্রারম্ভিক পরিচয়টুকুও ছিল না এতকাল। আগেই বলেছি আমদের কিছু পুরোনো বন্ধু ও ক্ষীরোদের প্রাক্তন সহকর্মী এপাড়ায় থাকেন। সেই ক'টি - কম পক্ষে আট দশটি - পরিবারের সঙ্গেই অগাধ বন্ধুত্ব আমাদের। রোজদিন দেখা হয়। আসা যাওয়া চলে অবিরত। সামনের বাড়ির দাসজীদের সম্বন্ধে কোন কৌতূহল অনুভব করিনি কোনদিন। ওরাও আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা করেনি। ওরা ব্যবসায়ী পরিবার। দারুণ বিত্তবান। তিনখানা গাড়ি, দামী সাজপোষাক, ডজন খানেক দাসদাসী, জোড়া বুলডগ। মোট কথা আমরা ধরেই নিয়েছি যে ওরা অন্য জগতের লোক। হঠাৎ এই বাড়ি রেজিস্ট্রির ব্যাপার নিয়ে ক্ষীরোদের সঙ্গে দারুণ দহরম মহরম শুরু হয়ে গেল দাসজীর।

বিশ বছর আগে হাজার তিরিশেক টাকায় আমাদের ফ্ল্যাটখানা রেজিস্ট্রি করা যেত। এখন লাগছে আড়াই লাখ টাকা। টাকার অঙ্ক শুনে মুখ শুকিয়ে গেল ক্ষীরোদের। ওর চেহারা দেখে ভয় হল হঠাৎ শক্ত কিছু অসুখ বিসুখ না হয়ে যায়। শুনলাম দাসজীর খরচ পড়বে সাড়ে সাত লাখ। দাসজী বাড়িটা অন্য কারো কাছ থেকে কিনেছে। সেই প্রথম বাসিন্দাও বাড়ি রেজিস্ট্রি করেনি। ফলে দাসজীকে ডবল করে রেজিস্ট্রি করতে হবে এখন। একবার সেই সাবেক ক্রেতার নামে, তারপর নিজের নামে। বোঝো ঠেলা! তবে ওরা তো টাকার কুমীর। সাড়ে সাত লাখ কেন, দরকার পড়লে আরও অনেক বেশী টাকা জোগাড় করতে পারে হেসে খেলে। ব্যাঙ্কেই কত টাকা তোলা রয়েছে বছরের পর বছর। কিন্তু আমরা এই আড়াই লাখ কোথা থেকে আনবো!

দাসজী বুদ্ধিমান লোক। উনি ঠিক আঁচ করতে পেরেছেন ব্যাপারটা। ক্ষীরোদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এ বিষয়ে। ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাওয়া যাবে না। বাড়ি রেজিস্ট্রি না হলে সে বাড়ি জামিন রেখে ব্যাঙ্ক টাকা দেবে না। এমনকি আমরা যদি অপারগ হয়ে বাড়িখানা বেচে দিতে চাই তারও উপায় নেই। রেজিস্ট্রি হয়নি এমন বাড়ির এখন আর খদ্দের পাওয়া যাবে না।

একমাত্র উপায় হল গয়নাগাটি ব্যাঙ্কে জমা রেখে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়া। আমি আগেই ক্ষীরোদকে বলেছিলাম আমার গয়নাগুলো বেচে দিয়ে টাকা জোগাড় করার কথা। ক্ষীরোদ রাজি হয়নি। দাসজীর 'গয়না জমা রেখে লোন নেবার পরামর্শ' ভেবে দেখতে রাজি হল। এতে ভাবাভাবির কিছুই ছিল না। অতগুলো টাকা অন্য কোন উপায়ে পাওয়া যাবে না। ক্ষীরোদকে মন খারাপ করতে দেখে বললাম, "ভাবছো কেন। গয়না তো আমাদেরই রইলো। আমাদের লকারে না রেখে অন্য একটা ব্যাঙ্কে রাখলাম। দুচার বছরেই টাকা শোধ করে ফেরৎ নিয়ে এসো ওগুলো।"

দাসজী নিজের চেনা স্যাঁকড়া পাঠিয়ে দিলেন। বাড়িতে এসে ইভ্যালুয়েট করে গেল। আমার মায়ের গয়না - আমার ঠাকুরমার গায়ে ছিল এক সময় - এছাড়া আমার শাশুড়ি নিজের গয়না যা আমাকে দিয়ে গেছেন। এগুলো জমা করে দিলে পুরো আড়াই লাখ টাকা পাওয়া যাবে ব্যাঙ্ক থেকে। বিরাট একটা সমস্যা মিটলো। দাসজী বলেছেন আমদের টাকাটা এসে গেলে একসঙ্গে স্ট্যাম্প্ পেপার কিনতে দেবেন। লোক ঠিক করে রেখেছেন। অর্থাৎ দাসজীর পিছু ধরে আমাদের কাজটাও সুষ্ঠুভাবে হয়ে যাবে। আমরা মানুষ চিনতে কত ভুল করি! এরকম ভদ্র পরোপকারী প্রতিবেশীকে এত বছর ধরে এড়িয়ে এসেছি বিত্ত-সর্বস্ব আত্মম্ভরি বড়লোক বলে। নিজেদের ভারী ছোট মনে হল।

লাল ভেলভেটের গয়নার বাক্সটা আমার বিয়ের সময়ের। চুড়ি কঙ্কণ দুল নেকলেস আংটি এসবের আলাদা ছোট ছোট ডিবেগুলো গয়নাসমেত একসঙ্গে ধরে যায় এই ভেলভেটের বাহারে বাক্সটাতে। বাক্সসুদ্ধুই নিয়ে যাচ্ছি ব্যাঙ্কে। নীচে দাসজী গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। ওঁর গাড়িতে যাবো আমরা। উনিই বললেন। আমাদের গাড়ি নেই। ট্যাক্সি করে অত গয়না নিয়ে যাওয়ার চাইতে নিরাপত্তার দিক থেকেও বর্তমান

ব্যবস্থাটাই ভাল হল। সত্যি প্রতিপদে দাসজীর কাছে কতভাবে যে ঋণী হলাম আমরা! ক্ষীরোদ নীচে নেমে গেছিল। আমার দেরী দেখে আমায় ডাকতে এলো। অধৈর্য গলায় বললো, "এতক্ষণ ধরে কি করছিলে? দেরী হয়ে যাচ্ছে যে!" আমি বলতে পারলাম না। আসলে আমি অনেক আগেই নীচে চলে যেতে পারতাম। ঘর থেকে বেরুবার মুখে মনের কানে যেন মা'র কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। মা উত্তেজিতভাবে একটা প্রবাদ বচন আওড়াচ্ছেন আমাকে লক্ষ্য করে।

ক্ষীরোদকে বললাম বাক্সটা ধর। আমি দরজা লক করে আসছি। ক্ষীরোদ সন্তর্পণে গয়নার বাক্স নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। আমি ওর পিছন পিছন নামলাম। লাল ভেলভেটের বাক্সটা খবরের কাগজ দিয়ে ভাল করে মুড়িয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা। ওটা যে গয়নার বাক্স বোঝে কার সাধ্যি! সিঁড়ির গোড়ায় দাসজীর ছেলে ডিম্পিকে দেখলাম। দাসজীর ঐ একটি মাত্র সন্তান। বয়স উনিশ কুড়ি বছর। ফ্রি-লান্স কিছু একটা করে, ডিজাইন টিজাইন কি সব। স্বামী স্ত্রী ও একটি ছেলে। ব্যস এই তিন জনের সংসার। অথচ বাড়িতে সর্বক্ষণ ধুম-ধমাক্কা লেগে আছে। বেশী টাকা থাকা ভাল জিনিস না খারাপ জিনিস কে জানে!

আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। ডিম্পি বাবার হাতে একটা ফ্লাস্ক ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। দাসজী গাড়ি স্টার্ট করে দিলেন। দু দুটো ড্রাইভার থাকা সত্বেও উনি নিজে গাড়ি চালাচ্ছেন কেন আমাদের এই অনুচ্চারিত প্রশ্নের উত্তরে মৃদু হেসে বললেন, "একটা ড্রাইভার ছুটিতে আছে। অন্যজন গিন্নীকে নিয়ে করোলবাগ যাবে, শালার মেয়ের পাকা দেখা আছে আজ। ডিম্পি যেতে চাইলো না।" আমাদের প্রয়োজনের খাতিরে উনি স্ত্রীর সঙ্গে করোলবাগ যেতে পারলেন না সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। মনটা কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো।

কলোনির গেট থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরে গেল গাড়ি। আধ কিলোমিটার দূরে পেট্রোল পাম্প। গাড়িতে পেট্রোল ভরিয়ে নিলেন দাসজী। গাড়ির চাকাগুলো চেক করালেন। পিছনের চাকায় সামান্য একটু হাওয়া ভরতে বললেন। সবদিকে আঁটঘাট বেঁধে ব্যাঙ্ক অভিমুখে যাত্রা করলাম আমরা।

অফিস যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়নি তখনও। রাস্তা তখনও মোটামুটি ফাঁকা। তবু তারই মধ্যে ঘটলো অঘটনটা। কালিন্দীকুঞ্জের কাছে আমাদের গাড়িটার সঙ্গে সামনের গাড়িটার একটু ছোঁয়াছুয়ি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা ঘ্যা - স্- স্ - স্ করে ব্রেক কষে থেমে গেল। গাড়ি থেকে দুটি যুবক যুদ্ধং দেহি ভঙ্গিতে বেরিয়ে এসে দাসজীর জানলায় সজোরে টোকা দিল। দুজনেরই মুখভর্তি দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, চোখে কালো চশমা। দিল্লীতে এধরনের ঘটনা জলভাত। দোষ যারই হোক, জোর যার মুল্লুক তার। সামান্যতম সত্যি বা কাল্পনিক দোষত্রুটির জন্যে খুনখারাপিতেও পিছপা হয় না এরা। দাসজী গাড়ির মধ্যে বসেই দুই হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে লাগলেন বারংবার। ছেলেদুটি সেদিকে দৃকপাত না করে ঝুঁকে গাড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল দুদিকের দুই জানলা দিয়ে। দাসজীর দিকের ছেলেটির হাতে রিভলবার। অন্য ছেলেটা ক্ষীরোদের দিকের দরজা খুলে ক্ষীরোদের হাত থেকে কাগজমোড়া ভেলভেটের গয়নার বাক্সটা হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল। মুহূর্তের মধ্যে লাফ মেরে ছোকরাদুটো নিজেদের গাড়িতে ঢুকে পড়লো। গাড়িটা হুস করে বেরিয়ে গেল।

আমার দারুণভাবে বমি পেয়ে গেল। কোনমতে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে বমি করতে লাগলাম। ক্ষীরোদকে বললাম, "আমি মরে যাবো। শীগ্গীর আমায় অন্য কোথাও নিয়ে চলো।" ক্ষীরোদ আমার হাত ধরে বললো, "এসো, গাড়িতে উঠে বসো।" আমি হাত ছাড়িয়ে ছিট্‌কে দূরে সরে গেলাম। "না না মরে গেলেও আমি ওই গাড়িতে যাবো না। ট্যাক্সি ডাকো। ওই তো অটো রিক্সা যাচ্ছে। রোকো! রোকো!" ততক্ষণে দুচারজন কৌতূহলী মানুষ জড়ো হতে শুরু হয়ে গেছে। ক্ষীরোদ অগত্যা আমাকে নিয়ে অটোরিক্সায় উঠে বসলো। দাসজীকে বললো, "আপনি থানায় চলে যান। আমি একে একটু শান্ত করে নিয়ে আসছি।" দাসজী গাড়িতে ঢুকে গেলেন। ক্ষীরোদ আমায় নিয়ে ডঃ সোমের ক্লিনিকে চললো। ডঃ সোম আমাদের পূর্ব পরিচিত। আর্মি থেকে রিটায়ার করে প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করছেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা তাঁর ক্লিনিকে পৌঁছে গেলাম।

ততক্ষণে আমি অনেকটা সামলে নিয়েছি। অটো রিক্সায় আসার সময় আমার যে কথাগুলো ক্ষীরোদ আচমকা মানসিক চাপে উত্তেজিত অবস্থার প্রলাপ ভেবে গা করছিল না সেই কথাগুলোই আবার করে

বললাম। ক্ষীরোদ ডঃ সোমকে বললো। ফোনে পুলিস স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। পুলিস স্টেশনে ডেকে পাঠালো আমাদের। সেখানে গিয়ে সবিস্তারে আমার যা কিছু জানা ছিল বললাম। পুলিস দাসজীকে ও ডিম্পিকে থানায় নিয়ে এলো। দুজনেই কবুল গেল সবকিছু। নানারকম কালো ধান্ধা চোরাই কারবার করেই বড়লোক হয়েছে দাসজী। ক্ষীরোদকে সহজ শিকার মনে করে হিতাকাঙ্খীর ভেক ধরে এগিয়ে এসেছিল। নিজের গাড়িতে বসিয়ে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবার অছিলায় গয়নাগুলো আত্মসাৎ করার মতলব করেছিল। ডিম্পি আর ড্রাইভার ছোকরা দাড়ি গোঁফ কালো চশমা লাগিয়ে এলেও ডিম্পির কব্জিতে অদ্ভুত আকারের ছোট্ট একটা কাটা দাগ দেখে তাকে চিনতে আমার একটুও দেরী হয়নি। দাসজীকে ফ্ল্যাস্ক দেবার সময় দাগটা প্রথম আমার চোখে পড়ে।

দাসজী আর ডিম্পি পুলিসকে গয়নার হদিস দিতে পারেনি। গয়নাগুলো ওদের হাতেই আসেনি মোটে। ডিম্পি ছিনতাই করেছিল লাল ভেলভেটের উপর খবরের কাগজ মোড়ানো বাক্সখানা। তার মধ্যে গয়নার ডিবেগুলোই ছিল শুধু। একটাও গয়না ছিল না। আসল ব্যাপারটা তবে বলি। বাড়ি থেকে বেরুনোর পূর্বমুহূর্তে মার মুখে শোনা একটা প্রবাদবচন মনে পড়ে গেল। মনে হল মা যেন বার বার করে বলছেন সাবধানের মার নেই। সাবধানের মার নেই। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গয়নাগুলো ভেলভেটের বাক্স থেকে বার করলাম। তিনছড়া হার গলায় পরে নিলাম, হাতে চুড়ি কঙ্কন মানতাশা। গলাবন্ধ ফুলস্লিভ শোয়েটারে ঢাকা পড়ে গেল সব। কানের দুল আর আংটিগুলো পেটকোচে বেঁধে নিলাম। তারপর ডিবেগুলো গয়নার বাক্সে পুরে আবার কাগজ দিয়ে মুড়ে দিলাম আগের মতন করে।

সেদিন থানা থেকে ফিরে আমরা আর নিজেদের বাড়ি যাইনি। ময়ুরবিহারে আমার মাসতুতো দিদি থাকে। তার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। হপ্তা খানেক ছিলাম সেখানে। ক্ষীরোদ এর মধ্যে দুএকবার আমাদের পাড়া থেকে ঘুরে এলো। সেখানে আমাদের বন্ধুরা খবরাখবর রাখছিল, আমাদের সঙ্গে ময়ুরবিহারে এসে দেখা সাক্ষাৎ করে যেত রোজই কেউ না কেউ। শুনলাম দাসজীর বাড়ি তালাবন্ধ। কেউ আর থাকে না সেখানে। ট্রাকে জিনিসপত্র বোঝাই করে দাসজী সপরিবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। দাসজী ও ডিম্পি আর তাদের সেই ড্রাইভারটাকে পুছতাছ -জেরা করার জন্যে থানায় ডেকেছিল পুলিস। তারপর বোধহয় তাদের বিরুদ্ধে আর কোন অ্যাক্শন নেয়নি। গয়নার খালি বাক্স ছিনিয়ে নেওয়া আর গয়না ছিনিয়ে নেওয়া হয়তো এক পর্যয়ের অপরাধের মধ্যে পড়ে না। খালি বাক্স কেড়ে নিয়ে সত্যিই তো ওরা কোন ক্ষতি করেনি আমাদের। ওদেরই হয়রানি হল খামোকা। আমরা আর এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

ময়ুরবিহার থেকে পরদিনই গয়না জমা দিয়ে টাকার ব্যবস্থা করে এলাম আমরা। ডাঃ সোম সঙ্গে গেলেন। আমরা তাঁর গাড়িতেই গেলাম। আমাদের ফ্ল্যাটখানা সময়মত রেজিস্ট্রি হয়ে গেল, দৈনিক জরিমানা শুরু হবার আগেই। এরপর একটা ভাল দিন দেখে বাড়িতে একটু শান্তি সস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করলাম। বন্ধুবান্ধবদের জন্যে খাওয়া দাওয়ার আয়োজনও ছিল। রান্না বান্না কিছুটা বাড়িতে করেছিলাম। দুচারটে পদ হোটেল থেকে আনালাম। শেষ পাতে ছিল দই মিষ্টি ও আইসক্রিম।

সেদিন বারবার মনে হচ্ছিল যেন মার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। মা খুশি-খুশি গলায় বলছেন, "সব ভাল যার শেষ ভাল।"